জমির আগাছা দমন

প্রতিরোধী ব্যবস্থা

১) ফসল লাগানোর আগেই জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে, ২) সেচের জল ও জৈব সারের মাধ্যমে আগাছার বীজ যেন জমিতে না আসে, ৩) গ্রীষ্মের সময়ে জমিতে লাঙল দিয়ে মাটি আলগা করতে হবে।

অন্যান্য কৃষি পদ্ধতি

১) আগাছা মুক্ত সবজি বীজের ব্যবহার, ২) সঠিক পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি, ৩) জমির অবস্থান অনুসারে সঠিক সবজি নির্বাচন, ৪) অঙ্কুরিত বীজ কন্দ (আলু, ওল, কচু) জমিতে লাগানো, ৫) বীজ/চারা লাগানো ও স্থানান্তরের জন্য সঠিক সময় নির্বাচন, ৬) সঠিক দূরত্বে বীজ/চারা লাগানো, ৭) সঠিক শস্যপদ্ধতি নির্বাচন, ৮) অন্তর চাষ, ৯) আচ্ছাদন ফসলের চাষ, ১০) সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ, ১১) জৈব পদ্ধতিতে আগাছা দমন করা যায় বিভিন্ন কীটপতঙ্গ, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে।

জৈব পদ্ধতিতে রোগ-পোকা প্রতিরোধ

উদ্ভিদজাত কীটনাশক

কিছু কিছু উদ্ভিদের পাতা, মূল, বীজ বা ছালের নির্যাস সবজির রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্ভিদজাত কীটনাশক	কীটশত্রু ও রোগ
নিমের অ্যাজাডাইরেকটিন যৌগ	বিভিন্ন কীটশত্রু
চোতরা ও তুলসী পাতার নির্যাস	আলু, বিন, টম্যাটো, বেগুন, লঙ্কা, কপি ও পেঁয়াজের লিফ মাইনার
জমিতে গাঁদার মূলের গুঁড়ো প্রয়োগ	মাটির কৃমি
আতা বীজের নির্যাস	বাঁধাকপির ডায়মন্ড ব্যাক মথ
লেমন ঘাস পাতার নির্যাস	লেদা পোকা
রসুন প্রাপ্ত অ্যালিসিন	বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া
সজনে গাছের মূলের নির্যাস	বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া
বনবেগুনের পাতার নির্যাস	অ্যানথ্রাকনোজ রোগ
নিম ও তামাক পাতার নির্যাস	ধসা রোগ

জীবজাত কীটনাশক

কিছু জীবাণু ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস শাক-সবজির অনেক রোগ ও পোকা প্রতিহত করতে পারে।

জীবাণু	কীটশত্রু ও রোগ
ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস (ব্যাকটেরিয়া)	বাঁধাকপির ডায়মন্ড ব্যাক মথ
নিউক্লিয়ার পলিহেড্রোসিস ভাইরাস (ভাইরাস)	বাঁধাকপির ডায়মন্ড ব্যাক মথ
ট্রাইকোডার্মা এট্রোভিরিডি (ছত্রাক)	আলু ও টম্যাটোর নাবি ধসা
ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি (ছত্রাক)	টম্যাটোর গোড়া পচা রোগ
পাসিলোমাইসেস লিলাসিনাস (ছত্রাক)	আলু ও টম্যাটোর নিমাটোড
পাসটিউরিয়া পেনিট্রান্স (ব্যাকটেরিয়া)	টম্যাটো ও লঙ্কার নিমাটোড
ভারটিসিলিয়াম লেকানি (ছত্রাক)	লঙ্কার জাব পোকা
স্টারমিয়া পারাক্রাইসপ্স (ছত্রাক)	বেগুনের কাণ্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকা
নিউক্লিয়ার পলিহেড্রোসিস ভাইরাস (ভাইরাস)	শিমের ফল ছিদ্রকারী পোকা

কিছু বন্ধুপোকাও শাকসবজির অনেক রোগ ও পোকা প্রতিহত করতে পারে।

পরজীবী/পরভোজী বন্ধু পোকা	কীটশত্রু ও রোগ
ক্যাম্পোনোটাস সারভিসিয়াস	বাঁধাকপির ডায়মন্ড ব্যাক মথ
ওরিয়াস আলবিডিপেনিস	পেঁয়াজের চিরুনি পোকা
ওলিগোটা ম্যাক্সিডেনটেক্স	লঙ্কার চিরুনি পোকা
ব্রাকন	ঢ্যাঁড়সের কাণ্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকা
ট্রাইকোগ্রামা	টম্যাটোর ফল ছিদ্রকারী পোকা
সোলেনোটাস	মটরশুঁটির লিফ মাইনার
ওপিয়াস	কুষ্মাণ্ডজাতীয় সবজির ফলমাছি

রোগপোকা দমনে অন্যান্য কিছু ব্যবস্থা

১) আলোক ফাঁদ, ২) জমিতে পাখি বসার ব্যবস্থা, ৩) গাছ লাগানোয় বৈচিত্র্য, ৪) কীটশত্রুদের খাদ্যাভাসে পরিবর্তন, ৫) গুল্ম দিয়ে চাষের জমির চারপাশ ঘিরে দেওয়া, ৬) ফাঁদ ফসলের চাষ, ৭) ফেরোমন ফাঁদ, ৮) জমির চারপাশ শেড নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া।

জৈব কৃষি : সমস্যা

ক) জৈব উপকরণের উৎপাদন, জোগান ও প্রয়োগ কষ্টসাধ্য।

খ) ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়।

গ) বিপণনের অসুবিধা ও সঠিক দাম না পাওয়া।

ঘ) পরিকল্পিতভাবে কোনো জৈব সবজি বাজার গড়ে না উঠা।

জৈব কৃষি : সম্ভাবনা

ক) তদারকি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে আরো সুসংগঠিত করা দরকার।

খ) আমাদের রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা বেশি। সবজি চাষে জমি কম লাগে। সেজন্য সবজি চাষে অনায়াসে জৈব কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গ) উৎপাদকদের মধ্যে সমবায় (যেমন এফ.পি.ও.) গঠন করা দরকার।

ঘ) পরিবহণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

ঙ) জৈব কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

চ) জীবাণু সার ও কেঁচোসার উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

ছ) জৈব কৃষি বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

ছায়া ঘরে (Shade Net) পান চাষ

গ্রামের পথে হাঁটতে গিয়ে খড়-বাঁশ-পাটকাঠি দিয়ে তিনদিকে ছাওয়া একখণ্ড জমি নজরে পড়েনি, এমনটা ভাবা যায় না। বিশেষত তা যদি দক্ষিণবঙ্গের কোনো গ্রাম হয়। ঠিকই ধরেছেন, পানের বরজের কথা বলছি। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পান চাষে শীর্ষস্থানে। দেশের মোট উৎপাদনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ এ রাজ্যই জোগান দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মূলত পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪-পরগনা ও নদিয়া জেলাতে পানের চাষ দেখা যায়। ২০১৪-১৫ সালের নিরিখে পানের এলাকা ও উৎপাদন নিম্নরূপ —

প্রধান উৎপাদক জেলা	চাষের এলাকা (হাজার হেক্টর)	পাতার উৎপাদন (হাজার মেট)
পূর্ব মেদিনীপুর	৬.১৯২	৫৫.৬৪৯
হাওড়া	৩.৪২৬	২৪.১২
পশ্চিম মেদিনীপুর	২.১৯	১৯.৭৪৬
দক্ষিণ ২৪-পরগনা	২.৭৫	১৮.৩১৯
নদিয়া	১.৯৫৯	১৩.৬৮১
রাজ্য	**১৯.৪৫৫**	**১৫১.৩৭**

উত্তরবঙ্গের তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলেও অনেক পান বরজের দেখা মেলে। পানের পাতা যেহেতু সরাসরি চিবিয়ে খাওয়া হয়; সেজন্য এর স্বাদ, পাতার নরম ভাব, রং ইত্যাদি রক্ষা করতে চাষ করা হয়। বরজের মধ্যে, রোদের তাপ, ঝোড়ো হাওয়া ও ঠান্ডার প্রকোপ থেকে পানকে বাঁচাতে উত্তরবঙ্গের ব্যাপক এলাকায় বাগানের নারকেল, সুপারি কিংবা আমগাছের সঙ্গে খোলা জায়গাতেও পান লাগানো হয়। পাতার ঝাঁঝ বেশি, পুরু, ছিবড়াযুক্ত। নাম 'গাছপান'। কিন্তু দেশে সাধারণ পান-রসিকদের পছন্দ বাংলা, সাঁচি, কাপুরি, নয়তো মিঠা পানের প্রাণ ভোলানো গন্ধ আর অপূর্ব স্বাদ।

ঠিক সেই কারণেই চাষি ভাইদের তৈরি করতে হয় বরজ। চারিদিকে বাঁশের খুঁটি পুঁতে তিন দিক ঢেকে তৈরি করা হয় প্যান্ডেলের আকারে। পাতাগুলি ঢাকা হয় পাটকাঠি দিয়ে, ওপরে ছাউনি বিছানো হয় খড় কিংবা ঘাস দিয়ে। ভেতরে সারি করে লাগানো হয় পানের পাতার কাটিং। লতিয়ে ওঠার জন্য মাটি থেকে বরজের মাথা ছুঁয়ে পোঁতা হয় বাঁশের কাঠি। এই কাঠি ধরে বাড়তে থাকে পানের লতা। বরজের মাথা ছুঁলেই নামিয়ে দেওয়া হয় মাটিতে। তারপর ওই লতা মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে ডগাটাকে বেঁধে দেওয়া হয় কাঠির সঙ্গে আবার বাড়ার জন্য। চাষী ভাইরা বরজের মধ্যে ঢুকে পানের পরিচর্যা করেন। পান বহুবর্ষজীবী, সেজন্য বারবার লাগানো দরকার হয় না। সারাবছর ধরে পানের পাতা তুলে বাজারে বিক্রি করে সংগ্রহ করেন সংসার চালানোর পুঁজি। এ যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপি।

কিন্তু সমস্যা দেখা যায় অন্যত্র। বাঁশ, পাটকাঠি, খড় দিয়ে তৈরি বরজ প্রকৃতির নিয়মেই কিছুদিনের মধ্যেই দুর্বল হয়, গোড়ায় উই ধরে, বাঁধন খুলে যায়, ঘুণ ধরে। সেজন্য ফসল নষ্ট হবার ভয়ে দরকার হয় নিয়মিত মেরামতি।

এতে অনেক খরচ হয়। এরপর আসি ছাউনির কথা। ওপরের খড়/ ঘাসের ছাউনি পাতলা(ফাঁকা) বা ঘন করতে হয়। এতে আবার সেগুলি পরে গুঁড়ো হয়ে পানের বরজে পাতার ওপর পড়ে। বরজ নোংরা হয়। লোক লাগিয়ে বরজ/পাতা পরিষ্কার করতে হয়। পানের বরজ খড়, পাটকাঠি ইত্যাদি পচনশীল পদার্থ দিয়ে বানানো হয় বলে ভিতরের আর্দ্র পরিবেশে রোগপোকার আক্রমণ বাড়ে। এইসব সমস্যার সমাধানে এখন এসেছে শেডনেটের সাহায্যে তৈরি বরজ পানের চাষ।

শেডনেট (shade net) হল সিন্থেটিক জাল, যার মধ্যে অনেক ফুটো থাকে আলো হাওয়া চলাচলের জন্য। প্রয়োজনমতো এই ফুটো বড়, ছোট, ঘন বা পাতলা হয়। সেইমতো শেডনেটকে শতকরা হিসেবে ২৫ শতাংশ, ৫০ শতাংশ, ৭৫ শতাংশ ইত্যাদি বলা হয়। পান চাষের জন্য ৫০ শতাংশ সবুজ রঙের শেডনেটই সবচেয়ে ভালো। এই শেডের সাহায্যে বরজের তিনদিক ঢেকে দেওয়া হয়। বেশি হাওয়া চলাচলের জন্য প্রয়োজনমতো জাল কেটে জানালা তৈরি করা হয়। আর থাকে দরজা। অতিরিক্ত গরমের সময় এর মাধ্যমে ভেতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে। নেট টাঙানোর জন্য শক্ত বাঁশের কাঠামো তৈরি করা হয়। তবে সবচেয়ে ভালো গ্যালভানাইজ্‌ড লোহার পাইপ (galvanised iron pipe or G. I. Pipe) দেখতে নীচু প্যান্ডেলের মতো লাগে। অর্থাৎ বরজের সবকিছুই রইল। শুধুমাত্র পরিবর্তন হল ছাউনির, বরজের চারিদিক এবং ভিতরের পাইপের খুঁটিগুলি সিমেন্টের বেদির ওপর বসানো হয়, যাতে সহজে ভেঙে না পড়ে। এর সাথে যোগ করা হয় জলসেচের জন্য Micro-Irrigation System বরজের ভেতরে পাইপের সাহায্যে এটি বসানো হয়। এর ফলে পরিমিত অথচ নিয়মিত জলসেচ করা যায় পানগাছে। পাতাগুলোও ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। জল কম লাগে, আর মেশিনের সাহায্যে পরিচালিত হয় বলে জল দেওয়ার জন্য কোনো শ্রমিকও দরকার হয় না।

এই বরজ তৈরির প্রাথমিক খরচ কিছুটা বেশি হলেও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় ৮-১০ বছর রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলা থাকে না। প্রয়োজনমতো সামান্য মেরামতিতে আরও অনেকদিন চলে। বরজ পরিচ্ছন্ন থাকায় রোগপোকার আক্রমণও কম হয়। কাজেই কীটপোকানাশকের প্রয়োজনও কম হয়। তাছাড়া কালবৈশাখী ঝড়, নিম্নচাপ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বরজ সহজে ভেঙে পড়ে না। ফলে ফসলহানি হয় না। কিছু কিছু জায়গায় বন্যপ্রাণীর আক্রমণ, বিশেষত গবাদি পশু ও হনুমানের দাপটে বরজ নষ্ট হয়। শেডনেটের মজবুত বরজে সেই ভয় অনেক কম থাকে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, শেডনেটের বরজে উৎপন্ন পানের পাতা অনেক বড় হয় এবং উজ্জ্বল সবুজ রং পায় — তাই বাজারে বিক্রয়মূল্য বেশি। তাছাড়া এই ভাবে যত্ন করার ফলে ফলনও বাড়ে।

তাই পুরোনো ধ্যানধারণা বদলে চাষিভায়েরা শেডনেটের তৈরি বরজে আগ্রহী হলে ভালো হয়। অনেকেই প্রাথমিকভাবে বেশি খরচের কথা ভাবেন। এবং সেটাই স্বাভাবিক। তবে আনন্দের কথা হল এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি মিলছে। উদ্যান পালন বা কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করলেই কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। জাতীয় উদ্যান মিশন প্রকল্পে (NHM) অর্থানুকূল্যে প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গে শেডনেটের সাহায্যে তৈরি দীর্ঘস্থায়ী বরজ বিভিন্ন জেলায় হচ্ছে। বরজের মাপ সাধারণভাবে ৫০০ বর্গ মি. থেকে ১০০০ বর্গ মি. পর্যন্ত। দক্ষিণ ২৪-পরগনার

এই সংখ্যা এখন প্রায় ৫০০ ছাড়িয়েছে।

সহজ কথায়, শেডনেটের সাহায্যে তৈরি বরজ পানচাষের সুবিধাগুলি হল —

১। বরজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকায় রোগপোকার আক্রমণ কম হয়।

২। পানের পাতা আকারে বড়, উজ্জ্বল রং হওয়ায় বাজারে চাহিদা বেশি।

৩। নিয়মিত আলো-হাওয়া চলাচলের কারণে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

৪। ফলন বেশি, তাই আয়ও বেশি।

৫। সারা বছর, এমনকি শীতকালেও পাতার ফলন ভালো পাওয়া যায়।

৬। বরজের গঠন মজবুত হওয়ায় ঝড়ে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙে পড়ে ফসলহানি ঘটায় না।

৭। বন্যপ্রাণী বিশেষত হনুমানের তাণ্ডব ঠেকাতে পারে।

৮। রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম, ৮-১০ বছর নিশ্চিন্তে থাকা যায়।

৯। জলসেচের জন্য জল কম লাগে। সেচ দেওয়ার জন্য আলাদা শ্রমিক লাগে না, জলের সঙ্গে সার মিশিয়ে দেওয়া যায়।

১০। মজুরির সাশ্রয় হয়। ফলন বেশি। সেজন্য আয়ও বেশি আসে।

তথ্যসূত্র : Betelvine Cultivation in Hightech Shade-net Boroj : DVD Pub. by Aerotech Engg. Works, Kolkata.

পলিথিনের ছাউনির ভিতর বাণিজ্যিকভাবে জারবেরা উৎপাদন

মানবসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেমন জীবনধারণের মানের উন্নতি সাধন ঘটেছে, ঠিক তেমনি বাজারে ফুলের চাহিদা ও জোগান ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি ফুলকে সাধারণত দেবদেবীর পূজার্চনাতে কাজে লাগায়, তবে বর্তমান আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছ পরিবারগুলি তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে কাটা-ফুলকে জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করেছে। সেই কারণে কাটা-ফুলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতি বছর। আমাদের দেশের তুলনায় এই কাটা-ফুলের চাহিদা উন্নত দেশগুলিতে কয়েক গুণ বেশি, সেজন্য কিছু কিছু ফুল আমাদের দেশ থেকে আমদানি করে।

আমাদের দেশে প্রায় ২-৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফুল চাষ হয়, যেখানে প্রায় ২২.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন ফুল উৎপাদন হয় (ঝুরো ফুল = ১৭.৫৪ ও কাটা-ফুল = ৫.৪৩ টন)। ফুল উৎপাদনে যে-সব রাজ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে অন্যতম হল তামিলনাড়ু, কর্নাটক, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ। আমাদের দেশে যে ফুল উৎপন্ন হয় তার বাজারবিক্রিত মূল্য প্রায় ৩৭০০ কোটি টাকা, যা সারা বিশ্বের ফুল উৎপাদন মূল্যের ০.৬১ শতাংশ। আমাদের দেশ থেকে বিদেশে যে ফুল যায়, তার মূল্য হল মাত্র ৪৫৫.৯০ কোটি টাকা, অর্থাৎ ভারতবর্ষের মোট উৎপাদিত ফুলের ১২.৩৭ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। আমাদের দেশ থেকে বিদেশে কাটা-ফুল যায় প্রায় ১৩.৩৪ কোটি টাকার এবং এদেশ থেকে ফুল আমদানি করে এমন দেশগুলি হল অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর এবং ইউরোপীয় কিছু দেশ। বর্তমানে আমাদের দেশের কাটা-ফুলের চাহিদা বিদেশের বাজারে বিশেষ কদর পাচ্ছে (ইউরোপীয় কিছু দেশ, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া)। যেসব কাটা-ফুল বিদেশে যাচ্ছে তার বেশিরভাগটাই পলিথিন ছাউনির ভিতরে হয় যেমন — গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, অর্কিড, জারবেরা ও লিলি ফুল।

পশ্চিমবঙ্গে ফুলের চাষ বহু পুরোনো, বেশ কিছুদিন এই চাষটি গরিব চাষিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান ফুলচাষিরা আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হওয়াতে তারা এই চাষে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, এছাড়া ভারত সরকার ভালো ফুল তৈরির জন্য প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ ভর্তুকি দেয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (NHB, APEDA, NABARD, NHM, RKVY ইত্যাদি)। কাটা-ফুল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান দখল করেছে সারা ভারতবর্ষে (২৭%); কিন্তু গুণগত মানের দিক থেকে কর্নাটক, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর চেয়ে পিছিয়ে থাকার জন্য সেভাবে চাষিভাইয়েরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারছেন না। এই ফুলের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য পলিথিনের ছাউনির ভিতর ফুল চাষ করা দরকার। আমাদের এই রাজ্যে যেসব ফুলগুলি গ্রিন হাউসের মধ্যে চাষ করা যেতে পারে তাদের মধ্যে অন্যতম হল — জারবেরা, অর্কিড, চন্দ্রমল্লিকা ও লিলিফুল। জারবেরা ফুলের চাষ সম্বন্ধে নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। বাণিজ্যিক ভাবে ফুল চাষের দিশা দিতে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অর্থানুকূল্যে একটি মডেল সেন্টার অফ ফ্লোরিকালচারাল এক্সলেন্স তৈরি হয়েছে।

জারবেরার চাষ :

সারা পৃথিবীজুড়েই প্রায় সব ধরনের পরিবেশেই জারবেরার চাষ হয়ে থাকে। নানা রঙের জারবেরা যেমন

বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমনি বাণিজ্যিকভাবে চাষ করেও যথেষ্ট লাভ পাওয়া যায়। নানা রঙে পাওয়া যায় বলে বাজারে এর চাহিদাও আছে। হলুদ, সাদা, গোলাপি, লাল, কমলা, মেরুন, টেরাকোটা ও নানা রঙের জারবেরা পাওয়া যায়। সবধরনের জারবেরা বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায় না। বাণিজ্যিক জারবেরার ফুল তুলনায় বড় ও বোঁটা লম্বা। ফুলদানিতে রেখে দিলে বেশ কয়েকদিন একই রকম থেকে যায়। বেশ কয়েক বছর হল যথার্থভাবে এদেশে বাণিজ্যিকভাবে জারবেরার চাষ হচ্ছে। মহারাষ্ট্র (বিশেষত পুনে), কর্ণাটক (ব্যাঙ্গালোর), অন্ধ্রপ্রদেশ (হায়দ্রাবাদ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি বিশেষত মেঘালয়, মণিপুর ও নাগাল্যান্ডে এই চাষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। সরকারি সহায়তায় এর চাষ শুরু হয়েছে। রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, বেথুয়াডহরি, দাসপুর, কালিম্পং ইত্যাদি অঞ্চলে এর চাষ শুরু হয়েছে। জারবেরার জন্ম বিদেশের মাটিতে হলেও, এই দেশে এর চাষ বাণিজ্যিকভিত্তিতে পলিথিনের ছাউনির মধ্যে করা যায়। এই চাষ যেমন লাভদায়ক, তেমনি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি নিখুঁতভাবে জানা দরকার, অন্যথায় মাঝ রাস্তায় বিপদে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। চাষ সম্বন্ধীয় কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হল।

পলিথিনের ছাউনি : বাণিজ্যিকভাবে জারবেরা চাষের জন্য পলি হাউসের প্রয়োজন। তবে আমাদের মতো আবহাওয়ায় উন্মুক্ত বায়ু চলাচলবিশিষ্ট বা Open Ventilated Poly-House-ই উপযুক্ত। তার ডিজাইন এমনভাবে করতে হবে যাতে গ্রীষ্মকালীন উচ্চ তাপমাত্রা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ জন্য সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন, সেটা হল উচ্চতা। কম করে ৫-৬.৫ মিটার উচ্চতা প্রয়োজন, যেটি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হবে। পলিথিন কম করে ২০০ মাইক্রন মোটা হবে। বাতাস চলাচলের জন্য দুইদিক ও ওপর দিক বায়ু চলাচলের জন্য খোলা রাখতে হবে। জারবেরা চাষের জন্য সাধারণত ৩৫,০০০-৪০,০০০ লাক্স আলোর তীব্রতা প্রয়োজন যেটা ৫০% শেড-নেট দিয়ে পাওয়া যায়। দুদিকের পলিথিন গরমকালে অবশ্যই খোলা থাকা প্রয়োজন। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গরমকালে ও সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত শীতকালে খোলা রাখা উচিত।

জলবায়ু : এই গাছটির জন্য দিনের বেলায় ২২-২৫ ও রাত্রি বেলায় ১৮-২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন, কিন্তু ৩৫ ডিগ্রির বেশি এবং ১২ ডিগ্রির কম তাপমাত্রাতে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি তাপমাত্রা ৩৫-এর বেশি হয় তাহলে ফগার ও গ্যারোনেট চালিয়ে তাপমাত্রা কমাতে হবে। তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রির কম হলে Side Ventilation বন্ধ করে ভেতরের তাপমাত্রা বাড়াতে হবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০-৮৫ শতাংশ এবং ১৪ ঘন্টা সূর্যের আলো গাছের পক্ষে অনুকূল। গ্রীষ্মকালে গাছের মাথার উপরে ৩০-৩৫ শতাংশ অ্যাগ্রোশেডনেট দিয়ে সূর্যালোকের তীব্রতা কমাতে হবে এবং সকালবেলাতে পাইপে করে গাছকে ভালো করে ধুইয়ে দিলে ভালো ফলন পাওয়া যেতে পারে। সাধারণত সন্ধে ৬টার দিকে ধারের নেট জাল ফেলে গ্রিন হাউসে বাইরের হাওয়া থেকে মুক্ত রাখা হয় এবং আবার ওই নেট সকাল ৬টাতে খুলে দেওয়া হয়।

মাটি : যেহেতু এর চাষ পলিথিনের ছাউনির মধ্যে হয়, সেজন্য ছাউনিটিকে উঁচু জায়গাতে রাখতে হবে যেখানে জল সহসা দাঁড়ায় না, দিনভর সূর্যালোক পায় এবং সমতল ভূমি। পলি হাউসে ড্রিপ, ফগার, গ্যারোনেট, অ্যাগ্রোশেডনেট, পাখা, ভেন্টিলেশান এবং জল পরিশোধনের ব্যবস্থা থাকা অবশ্যই দরকার। দোঁয়াশ বা বেলে-দোঁয়াশ মাটি যার

পি এইচ ৫.৫ - ৬.৫ সেই মাটি সবথেকে ভালো এই চাষের জন্য। জমির লবণাক্ততার মাত্রা কখনোই ১.০ ms/cm এর বেশি হওয়া উচিত নয়। সুতরাং জারবেরা চাষের জন্য স্থান নির্বাচনের আগে অবশ্যই মাটি ও সেচের জল পরীক্ষা করে নিতে হবে। বলতে গেলে লবণাক্ত মাটি ছাড়া সব ধরনের মাটিতেই জারবেরা চাষ করা যায়। জারবেরার শিকড় প্রায় ৫০-৭০ সেমি পর্যন্ত গভীরে চলে যায়। সেজন্য মাটি ভালো করে তৈরি করতে হবে।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ : এই ফুলটি জৈবজাতীয় সার বেশি পছন্দ করে, সেজন্য মাটি তৈরির সময় ৩০% জৈব পদার্থ মাটির সঙ্গে মেশাতে হবে। মাটির সঙ্গে নারকেল ছোবড়ার গুঁড়া, ভার্মিসার অথবা পচা গোবরসার ভালো করে মিশিয়ে ১.২৫ ফুট উঁচু, ২ ফুট চওড়াবিশিষ্ট বেড বানিয়ে তার সঙ্গে নিমখইল ১ কেজি প্রতিবর্গমিটার মেশাতে হবে। যদি মাটি এঁটেল হয় তাহলে ১০-১৫ শতাংশ বালি মেশালে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। এছাড়াও হিউমিক অ্যাসিড ৫০ গ্রাম দানা প্রতি ১০ বর্গমিটার মাটির সঙ্গে মেশালে গাছ সহজে মাটি থেকে খাবার নিতে পারবে। দুটি বেডের মাঝখানে এক ফুট জায়গা ছাড়তে হবে, যাতে কাজকর্ম বেডের মধ্যে ভালোভাবে করা যায়। বেড তৈরির পর, বেডকে জীবাণুমুক্ত করতে ফরমালিন ১০০ মিলি/লিটার জলে গুলে প্রতি বর্গমিটার ঢালতে হবে এবং কালো পলিথিন দিয়ে ৭ দিন বেডকে ঢাকা দিতে হবে। এরপর ঢাকা সরিয়ে জল দিয়ে বেডকে ভাসিয়ে দিতে হবে। বর্তমানে বাজারে $H_2O_2^+$ ন্যানো সিলভারজাতীয় তরল পাওয়া যায় যা দিয়ে শোধন করলে আর জল দিয়ে ধুতে হয় না উপরন্তু ভালো কাজ পাওয়া যায়। এজন্য সেচ দিয়ে মাটি ভেজানোর পর ৩.৫% (প্রতি লিটার জলে ৩৫ মিলি হিসাবে) হারে প্রতি বর্গমিটারে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি বর্গমিটার ১ লিটার হারে প্রয়োগ করতে হবে। দু-সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর টিস্যুকালচারের মাধ্যমে তৈরি চারাগাছ থেকে গাছ এবং সারি থেকে সারি ৩০ x ৩০ ও ৩৭ x ৩৭ সেন্টিমিটার দূরত্বে বসিয়ে জল দিতে হবে। তবে গাছ লাগানোর ঠিক আগে বেডে কিছু অজৈব সার এবং অনুখাদ্য প্রয়োগ করতে হবে — যেমন সিঙ্গল সুপার ফসফেট (২৫০ গ্রাম/বর্গমিটারে) + ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (৫ গ্রাম / বর্গমিটারে) + বায়োজাইম দানা (২০ গ্রাম/বর্গমিটার) + হিউমিক দানা (২০ গ্রাম / বর্গমিটারে)। গাছ লাগানোর পর প্রত্যহ সকালে হালকাভাবে জল দিতে হবে এবং পলি হাউসের মধ্যে ৮০-৯০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে ফগার চালিয়ে। ১০০০ বর্গমিটার জায়গাতে প্রায় ৬০০০টি চারা লাগানো সম্ভব।

সার ও জল প্রয়োগ : ভালো ফলন পেতে নিয়মিতভাবে সার ও অনুখাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। গাছ লাগানোর তিন মাস পর্যন্ত গাছের বৃদ্ধি হতে থাকে এবং তারপর ফুলের কুঁড়ি আসা শুরু হয়। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, যেসব সার জলে গুলে যায় সেগুলিকে ব্যবহার করা দরকার; যেমন ১৯-১৯-১৯-, ১৩-০-৪৫, ১২-৬১-০, ১৮-১৮-১৮ ইত্যাদি।

জারবেরায় সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে —

১। চারা রোপণের ৩ সপ্তাহ পর থেকে N:P:K @ 19 : 19 : 19 গাছপ্রতি 0.4 গ্রাম একদিন অন্তর দিতে হবে। এটি প্রথম তিন মাস চালু রাখতে হবে।

২। ফুল আসার পর N:P:K @ 15 :8 : 35 বা N:P:K @ 13 : 0 : 45+12:61:0 গাছপ্রতি 0.4 গ্রাম একদিন অন্তর দিতে হবে।

৩। বেডে যথেষ্ট পরিমাণে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অনুখাদ্য থাকায় প্রথম তিন মাস আলাদাভাবে কোনো অনুখাদ্য প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। তিন মাস পর থেকে প্রতি সপ্তাহে ৪০ গ্রাম প্রতি ১০০০ লি. জল হিসাবে অনুখাদ্য মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হবে।

৪। প্রতি ৩-৪ মাস অন্তর জৈবসার যেমন পচা গোবরসার বা কেঁচোসার প্রয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে জৈবসারের লবণাক্ততার মাত্রা 2ms/cm-এর কম হতে হবে।

৫। প্রতি ৩-৪ সপ্তাহ অন্তর মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

৬। নির্দিষ্ট মাত্রায় দ্রবণীয় সার যথেষ্ট পরিমাণ জলের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। না হলে মাটিতে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

সাধারণত : ফুল পাওয়া যায় সারা বছরে, শীতকালে ভালো ফুল নেওয়ার জন্য বর্ষাকালে গাছকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। বিশ্রামের পর গাছের গোড়া পরিষ্কার করে ভার্মিসার ও হিউমিক অ্যাসিড দিতে হবে এবং ১২-৬১-০ ও ১৩-০-৪৫ সার প্রথম সপ্তাহে প্রয়োগ করতে হবে। গাছে জল ও সার দেওয়ার সবথেকে ভালো সময় হল সূর্য উঠার ঠিক আগে। যে পাইপের সাহায্যে জল দেওয়া হয় ওই জলের সঙ্গে সার মিশিয়ে দিতে হবে। সার দেওয়ার পাঁচ মিনিট আগে বেডকে ভালো করে ভিজিয়ে দিতে হবে। এইভাবে সার প্রয়োগে গাছে ফলন ভালো পাওয়া যায়।

রোগপোকা ও তার প্রতিকার : জারবেরা চাষ বাণিজ্যিকভাবে যেহেতু পলি হাউসের ভিতরেই হয় তাই বাইরের আবহাওয়া ও ভিতরের আবহাওয়া বেশ কিছুটা তারতম্য হয়। গরম ও আর্দ্রতাও অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। সেকারণে রোগপোকার আক্রমণের তারতম্য ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের পাললিক অঞ্চলে রোগপোকা বেশি মাত্রায় আক্রমণ করে; সেগুলোর প্রতিকার সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হল।

সাদা মাছি (White fly) : অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রা ও শুষ্কতা হলেও এদের আক্রমণ বৃদ্ধি ঘটে। পাতার নীচের দিকে থেকে রস চুষে খায়। নতুন কুঁড়ি থেকেও রস চুষে খাওয়ার ফলে ফুলের আকার ছোট হয় ও কুঁকড়ে যায়। নিমাজোল ২ মিলি অথবা ইমিডাক্লোর প্রিড ৩.৫ মিলি প্রতি ১০ লিটার, অথবা অ্যাসিটামিপ্রিড ০.৪ গ্রাম অথবা ডাইফেনথিউরন ১.২৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

লালমাকড় (Red mite) : সাদা মাছির মতো এরাও পাতার নিচের দিক থেকে রস চুষে খায়। পাতার নিচের অনেক সময় বাদামি দাগ হয় ও পাতা প্রান্ত বরাবর শুকিয়েও যায়। কুঁড়ি ঠিকঠাক প্রস্ফুটিত হয় না ও ফুল বিকৃত আকার ধারণ করে। অ্যারমেকটিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

হলুদ মাকড় (Yellow mite) : পুরানো পাতাগুলো কুঁকড়ে যায়। নতুন পাতা পুরু হয়, বিকৃত হয়ে যায় ও চামড়ার মতো লাগে (Leathery)। ফুল বিকৃত হয়ে যায় ও অনেক সময় ঠিকঠাক প্রস্ফুটিত হয় না।

চোষী পোকা (Thrips) : এরাও পাতা, কুঁড়ি ও ফুল থেকে রস চুষে খায়। ফলে ফুল বিকৃত হয়ে যায়। অনেক সময় পাপড়িতে সাদা দাগ দেখা যায়।

জাব পোকা (Aphids) : এরাও নতুন পাতা বা কুঁড়ি থেকে রস চুষে খায়। ফুল বিকৃত হয়ে যায়। ডাইমিথোয়েট/ মেটাসিস্‌টস্কজাতীয় কীটনাশক জাব পোকাতে ভালো কাজ দেয়।

ক্যাটারপিলার (Caterpiller) : পাতা ও ফুলের পাপড়ি ফুটো ফুটো করে খেয়ে নেয়। অনেক সময় ফুলের পাপড়িতে সাদা ছোপ দেখা যায়।

কেড়ি পোকা (Beetle) : সাধারণত মাটিতে থাকে। লার্ভা অবস্থায় কুঁড়ি ও আগা নষ্ট করে প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। বিকালের পর এদের আক্রমণ শুরু হয়। গাঙ্গেয় পাললিক অঞ্চলে এদের আক্রমণে প্রচুর ক্ষতি হতে দেখা গেছে। ক্লোরপাইরফস্‌ অথবা অন্য দানাজাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

শিকড় ফোলা রোগ (Root knot mematode) : পাতা হলুদ হয়ে যায়, গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় ও গাছ ছোট হয়ে যায়। শিকড় ফুলে যায়। ফলন সাংঘাতিকভাবে কমে যায়। আকার ছোট হয়ে যায়। নিমকেক ৩০-৫০ গ্রাম প্রতি গাছে প্রয়োগ করতে হবে। কারবোফিউরান দানা ১০ গ্রাম প্রতি বর্গ মিটারে দিতে হবে। হাইড্রোজেন পার অক্সাইড + ন্যানো সিলভার ৭ মিলি প্রতি লিটার জলে দিয়ে স্প্রে করলে ভালো কাজ হয়।

রোগ :

গোড়া পচা (Root rot) : পিথিয়ামগোত্রীয় ছত্রাক আক্রমণের ফলে হয়। প্রথমে নতুন পাতা ঢলে পড়ে, পরে পুরো গাছটিই শুকিয়ে যায়। এ অবস্থায় জল ও সার প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে বা বন্ধ রাখতে হবে। কর্বেন্ডাজিম ১ গ্রাম এবং থায়োফেনেট-মিথাইল গোত্রের ওষুধ ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ভালো করে গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে।

ধসা (Bacterial blight) : পাতায় প্রথমে তৈলাক্ত হলুদ রঙের ছোপ দেখা যায় যেগুলো পরে বাদামি হয়ে যায়। কুঁড়ি শুকিয়ে যায়। অনেক সময় কাণ্ডে বাদামি ছোপ দেখা যায়। স্ট্রেপটোসাইক্লিন-জাতীয় ওষুধ ১ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার জলে প্রয়োগ করতে হবে।

পাতার দাগ (Alternaria leaf spot) : আর্দ্রতা বেশি থাকলে অনেক সময় পাতায় কালো গোলাকার দাগ দেখা যায়। কপার অক্সি ক্লোরাইড অথবা ম্যানকোজেব জাতীয় ওষুধ ২.৫ - ৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে ভালো।

পাতার দাগ : সারকোসপোরা ছত্রাকজনিত এই রোগ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। আক্রমণ বেশি হলে পাতা পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। অ্যাজোসস্ট্রোবিন/ডিফেনকোনজোল ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। জৈব ছত্রাকনাশক যেমন ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি বা ট্রাইকোডার্মা হারজেনিয়াম প্রয়োগে ছত্রাকঘটিত রোগের ক্ষেত্রে ভালো কাজ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে জৈব ছত্রাকনাশক প্রয়োগের ১০ দিন আগে বা ২১ দিন পর কোনো রাসায়নিক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যাবে না।

ফলন : দেখা গেছে যে প্রতি ১০০০ বর্গমিটার পলি হাউসে জারবেরা চাষে ১০ বছরে প্রায় ২৪-২৫ লক্ষ টাকা খরচ করে ৪০-৪২ লক্ষ টাকার ফুল বিক্রি করা যেতে পারে, অর্থাৎ এই সময়ে প্রায় লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ১৫-১৬ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে সম্ভাবনাময় অপ্রচলিত সবজি

খাদ্যসুরক্ষা মেটানোর প্রধান অস্ত্র হল খাদ্যে শাক-সবজির পরিমাণ বাড়ানো। কিন্তু এখনও কিছু কিছু সবজি সাধারণ মানুষের কাছে খুব পরিচিত নয়; এদের অপ্রচলিত শাক-সবজি বলা হয়। দিন দিন এইসব শাক-সবজির চাহিদা বেড়েই চলেছে। এই সমস্ত সবজি মহানগরী, নগরকেন্দ্রিক পাঁচতারা হোটেল এবং বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় উচ্চমূল্যে বিক্রিত হয়। তাই যদি আমরা এর উৎপাদন বাড়াতে পারি, তাহলে এই সমস্ত সবজির চাহিদাও মিটবে এবং তার সঙ্গে আয়ের পরিমাণও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের অপ্রচলিত সবজির পুষ্টিমূল্য সাধারণ সবজির থেকে অনেক পরিমাণে বেশি। ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে এই ধরনের সবজি খাওয়ার চল বেড়েই চলেছে।

অপ্রচলিত শাক-সবজির উদাহরণ :

ব্রোকোলি, চিনা বাঁধাকপি, লাল বাঁধাকপি, ব্রাসেলস স্প্রাউট, লেটুস, সেলেরি, পার্সলে, লিক ইত্যাদি।

পুষ্টিগত গুণ

- অপ্রলিত শাক-সবজির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম উপস্থিত থাকে। এছাড়া সবজিগুলির মাধ্যমে আমরা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, আয়রন, সোডিয়াম ইত্যাদি গ্রহণ করি।
- ব্রোকোলির মধ্যে সালফোরেন প্রচুর পরিমাণে থাকে যা ক্যান্সারের প্রবণতা কমায়।
- চিনা বাঁধাকপিতে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-সি থাকে।
- লাল বাঁধাকপিতে ভিটামিন-এ, সি, কে থাকে — এর সঙ্গে যথেষ্ট থিয়ামিন, রাইবোফ্লোভিন, ভিটামিন-বি-৬, ফোলেট ও আঁশসমৃদ্ধ।
- ব্রাসেলস স্প্রাউটে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও পটাসিয়াম থাকে।
- লেটুসে ভিটামিন - এ, বি, সি, কে এবং আয়রন থাকে।
- সেলেরি আঁশ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, জিঙ্ক, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও ভিটামিন-এ., বি., সি.,-সমৃদ্ধ।
- পার্সলেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ.বি.সি.কে. ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক ও আয়রন আছে।
- লিকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-এ, বি-৬, কে, ফোলেট, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন থাকে।
- গ্লোব আর্টিচোক কামোত্তেজক হিসাবে এবং বৃক্ক ও যকৃতের বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। সাইনারা নামক একটি অ্যান্টিকোলেস্টরল ড্রাগ থাকে এই সবজিতে।
- অ্যাসপারাগাস গাঁটে ব্যথা, হৃৎপিণ্ডের শোথ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।